তরাস

সসীম কুমার বাড়ৈ

পাড়াটা বৈশ্বানরের ভাল লেগেছিল। মধ্যবিত্তের একতলা, দোতলা বাড়ী। কর্ণার প্লট বরাবরই লোভনীয়। তার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে ভাবতেই পারেনি বৈশ্বানর। এ তল্লাটে জমি কোথায়,যা দু'একটা মেলে তা পুকুর ভরাট করা জমি। ঝুঁকি নেওয়ার দম নেই তার। মালিক - প্রোমোটার - দালাল - নেতা- ক্রেতার চেন। শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ক্রেতা,তার ধনে অনেকগুলো উটকো লোকের পোদ্দারি। সরকারি লোন নিতে গেলেই হ্যাপা। মিউটেশন, কনর্ভাসন আরও কত কি। অবশ্য লোক ওৎ পেতে আছে। ছাড় কড়ি মাখ তেল। টাকা ছড়ালে ওগুলো কোনো ব্যাপরই নয়। কিন্তু তার ক্ষেত্রে এসব সামলাতে হয়নি বললেই হয়। জমির মালিক সরকার বাবুর সবই রেডি ছিল। সাবেক বাগান বাড়ির কর্নার প্লটের হাত বদল মাত্র। বিয়াল্লিশ বাই পঁয়তাল্লিশ। এখন বাগান বাড়িটার হতশ্রী দশা। যেন একটা পুড়ে যাওয়া যৌবনের মতো। অনেকটা জাগয়া নিয়ে ছিল ঘোষ বাবুদের বাগান বাড়ি। দিনে পুকুরে ছিপ, রাতে ঝনক ঝনক পায়েল। বাবুরা যে কোথায় মিলিয়ে গেল ডোডো পাখির মতো। এখন হয়তো তাদের নাতি নাতনিরা নাইট ফিরিঙ্গি,জল যৌবন তরঙ্গ। ঘোষ বাগানের একমাত্র প্লটটা বেচে দিয়ে সরকার বাবু চলে গেলেন দক্ষিন কলকাতায়, সেখানে ফ্ল্যাট নিয়েছেন। সুখ পয়সায় মিললে কে চায় উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জিজীবন।

এখানেই বৈশ্বানর ব্যতিক্রমি, সে চায় মাটির সোঁধল গন্ধ। হাতে চাঁদ পাওয়ার মতোই জমিটা মিলেছে তার এক আত্মীয়ের কল্যানে। এ যুগের অবিশ্বাস্য ঘটনা হল দালাল ফি লাগেনি।

গল্পটা এখানেই শেষ হয়ে যেত,যদি না গলির মুখে ক্লাবটা থাকত। বাড়িতে হাত দিতেই বুঝল অনেক গুলো উৎসুক চোখ তাকে কিছু বলতে চায়। ওরা সরাসরি এলো সেদিন সন্ধ্যার পর। বাড়ি তৈরীর সুবিধার জন্য পাশেই ভাড়া নিয়ে থাকত তারা। সামনের ঘরে জনা ছয়েক ছেলে। বেপাড়ার ও আছে দু'একজন। দাদা গোছের ছেলেটা শুরু করল এভাবেই– কাকু আমরা সবাই নবকুড়ি ক্লাবের সদস্য। ভালই হল আপনি আমাদের পাড়ায় বাড়ি করে আসছেন। আপনার ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব আমাদের ক্লাবের আছে। আমাদেরও ছোট একটা আবদার আছে।

– যেমন ? বৈশ্বানর আবদারের গভীরতা বোঝার জন্য ছেলেগুলোর দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে।

– সামান্য ব্যাপার। দেখেছেন তো ক্লাবের একতলা বাড়ি। সদস্য সংখ্যা অনেক। একতলায় আর পোষায় না। দরকার দোতালা। আমাদের ইচ্ছা আপনি খানিকটা করে দেন। আপনার সাপ্লাইয়ারকে বলে দেবেন, এক লড়ি ইট আর বস্তা ত্রিশ সিমেন্ট।

– এ্যা,বল কি? এক লড়ি ইট আর ত্রিশ বস্তা সিমেন্টের দাম কত জান?

– কত আর হবে, হাজার পনের। আপনার পক্ষে সামান্যই।

বৈশ্বানর কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। হাজার পনের টাকা সামান্য। জমির লোন এখনও পুরোপুরি শোধ হয়নি। বাড়ি তৈরীর সরকারী লোনটা বরঞ্চ মিলেছে তাড়াতাড়ি। তাও রবিবাবুর কল্যানে। পূর্ব পরিচয় ছিল। অমুক বাবুর লোক তমুক বাবুর লোক হয়ে যেতে হয়নি। বৈশ্বানরের বেশ গর্ব হয়– আবেদন থেকে স্যাংসন,ট্রেজারি চেক ইত্যাদি মিলেছিল ঝড়ের বেগে এক মাসের মধ্যে। তার শুকতলা বেশ মজবুতই আছে। কিন্তু ব্যাংক পুষিয়েছে সময়। চেক কালেকশন দেড় মাস। সিষ্টেমটাই নাকি ওরকম। কালেকশন ফি, পোষ্টাল চার্জ সবই আছে। সময়ের কোন গ্যারান্টি নাই। বৈশ্বানরের কাছে পনের হাজার মানে সুদে আসলে পচিঁশ হাজার।

বৈশ্বানরের বলতে ইচ্ছা হয়– তোমরা কি ভাই এ পাড়ার ইজারা নিয়েছ নাকি। একটা ফুটবল চাইতে পার বা ক্রিকেটের সাজ সরঞ্জাম, দিয়ে দেব স্বেচ্ছায়। পৌরসভা কোন ট্যাক্স নিতে বাকি রাখেনি। ক্লাবকেও দিতে হবে শান্তি চাঁদা ? ক্লাব তার সদস্যদের উপরে কতৃত্ব ফলাতে পারে। প্রশ্নগুলি স্বাভাবিকভাবেই তার মাথায় আসে – কার প্রজা সে? রাষ্ট্রের না ক্লাবের।

বৈশ্বানর নিজেকে সংযত করে বলে – দেখ ভাই অত টাকা কোত্থেকে দেব , তোমাদের আবদার যতটা পারি মিটাব।
– আমরা কোন অন্যায় আবদার করিনি। এপাড়ায় ভদ্রলোকেরা থাকে। আমরা কম করেই চাই। অন্য পাড়ায় যেতেন বুঝতেন ঠ্যালাটা , ত্রিশ চল্লিশের নীচে কথা নেই।
– লোনের টাকা থেকে অতগুলো টাকা দেওয়ার মানে বোঝ?
– দেখুন দাদা,আপনার সাথে ফ্যাচর ফ্যাচর করতে আসিনি। পাঁচ সাত লাখের বাড়ি করবেন,যত কান্নাকাটি ক্লাবের টাকায়। টাকা দিয়ে বাড়ির কাজে হাত দেবেন। ছেলেটা অনেকটা হুকুমের সুরে বলল। পরে বৈশ্বানর জেনেছিল সে ক্লাবের সভাপতি। এই বয়সেই চেহারার আড়ালে হিংস্র মুর্তিটা লুকিয়ে রাখার কৌশল রপ্ত করেছে।

গলির মুখে কুত্তাগুলো ঘেউঘেউ করবেই। নেড়ি কুত্তার যা স্বভাব। বৈশ্বানর আর ধীরুভাই এক গোত্রিয় হল নাকি। ভূজিওয়ালা থেকে ধীরুভাই আম্বানি, রিলায়েন্সের কর্নধার। তার গতি ছিল হাতির মতো, পিছনে নেড়ি কুত্তার চিল চিৎকার না শুনলেও চলত। একটা জায়গায় তার সাথে বৈশ্বানরের কিছুটা মিল– দু'জনেই মাটি থেকে উঠেছে। কিন্তু অমিল এই যে, বৈশ্বানরের উত্তরন শূন্য থেকে একজন মাঝারি গোছের প্রশাসনিক অফিসারে, তার সীমাবদ্ধতা সে জানে। আর ধীরুভাইর অঙ্গুলি হেলনে টলে যেত সর্বশক্তিমান সরকার। আর তার ক্ষমতা দেখাতে গেলেই বিপদ। খোলের মধ্যে শূন্য। ক্ষমতা অ-দেখানোর খেলাটা খেলে যেতে চায় বৈশ্বানর। ক্লাব থেকে ভেসে আসা আওয়াজ- বউ ছেলে নিয়ে পাড়ায় থাকা গুটিয়ে দেব। কত চড়ুই এলো গেল-ফুরুৎ ফুরুৎ। হিম স্রোত নেমে যায় মেরুদন্ড দিয়ে, তবু বৈশ্বানরের মনে হয়-সৎপথে আয়ের পয়সা লুটের বাতাসা নয়। মগরা তো অনেক আগেই দেশ ছেড়েছে। সহকর্মী সতীশদা বলে–ওসব নীতির ফ্যচফ্যাচানি ছাড়ো। মগের রাজত্ব সত্যিকারে কোনদিন গেছে নাকি? এযুগের তোলাবাজেরাই আসল মগ। ভেকের রকম ফের। তোমার ওখানে ক্লাবের আড়ালে অন্যমুখ। তপসিয়া তিলজলায় বাইকের দাপটে, বন্দুকের নলে। লড়তে যেও না। তলিয়ে যাবে। বোঝাপড়া করে নাও। বৈশ্বানর এসব নিজে বোঝে না তা নয়। মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মনের একটা ভূমিকা থাকে। কিন্তু সেখানেই তার অসুবিধা।

এমনই একটা গোটা বাড়ি চেয়েছিল নৈর্ঋতি। ফ্লাটের নীল সুখ তার পছন্দ নয়। বাড়ির সামনে একটু সবুজ,ম্যাজনাইনের ব্যালকনির কোনে ঝুলে থাকা অ্যালামুন্ডা। নৈর্ঋতির কাছে বাড়ি মানে দেয়াশলাইর বাক্সর উপর বাক্স নয়, ভিতর বাইরে দুটো নিয়েই বাড়ি। বৈশ্বানরের কাছে আবদার করেছিল প্রত্যেক রুমের সাথে ব্যালকনি চাই। বৈশ্বানর কথা রেখেছে, খরচ একটু বেশী পড়েছে। নৈর্ঋতি চায় এমনই সুখি গৃহকোন। খোলামেলা ঘর বারান্দা। ঘরে ঢুকতেই মস্ত ভুড়িওয়ালা নৃত্যরত গনেশ মহারাজ। সন্ধ্যায় সাঁঝের বাতি, টুংটুং ঘন্টার আওয়াজ। নৈর্ঋতি-বৈশ্বানরের ফেং শুই নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। বৈশ্বানরের বক্তব্য ফেং শুই আসলে ভারতের বাস্তুতন্ত্রের চীনা সংস্করন। বিদেশী ছাপে লাফিং বুদ্ধ। বাজার নঃ পরমং তপঃ।
বিয়ের সময় নৈর্ঋতির মনে একটু খুঁত খুঁত ছিল। ছেলের বাড়ি নেই। নৈর্ঋতির বাবার বক্তব্য এব্যাপারে একেবারে আলাদা। বাড়ি নেই তো করে নেবে। চাকুরি ভাল হলে বাড়ি হতে কত দিন, পাত্রই আসল কথা।

গ্রাম থেকে বাবা চাকুরী সূত্রে উঠে আসার পর নৈর্ঋতিরা ভেসে বেড়িয়েছে ভাসা ফ্যানার মতো। অধিকাংশ সময়হ ভাড়া বাড়ীতে কাটানো। বাড়িওয়ালা প্রভূতুল্য। প্রভূর কথা দ্বিমত হলেই হল– না পোষালেই অন্য বাড়ি দেখুন। ব্রহ্মাস্ত্র ! দেখতে দেখতে মনে হত ভাড়াটিয়া আর মানুষ এক গোত্রিয় নয়। নিদেনপক্ষে সর্বহারার পরের শ্রেনী বিন্যাসে হওয়া উচিৎ ভাড়াটিয়া শ্রেনী।

নৈর্ঋতি সাজাতে চায় সংসার-বাড়ি। এক এক খানা ইট গাঁথার সাথে আনন্দের চোরা স্রোত বইত শরীরে। সকালে পাইপ দিয়ে জল দিতে দিতে নৈর্ঋতি ভেজা ইটে কান পেতে শুনত ইটের জল খাওয়া চিরচির শব্দ। নৈর্ঋতির রক্ত শরীরের রোমে রোমে বাড়ি আর রবীন্দ্রসংগীত। আনন্দধারা বহিছে ভূবনে। কিন্তু সুখ হলো জোনাকি আলো-অন্ধকারে ডুবে যায়। বাড়ির দক্ষিন দিকের বারান্দা থেকে দেখা যায় আসরের মাঠ। শিশুদের মাঠ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তনুকে মাঠে পাঠানোর কথা ভাবত নৈর্ঋতি। ভাবনা গুঁড়িয়ে দিতে লাগল রাত, লালবাতি এলাকা সত্যি সত্যিই কি শহরতলীতেও ছড়িয়ে পড়ল! আসরের মাঠ রাতে কাঁপে শিৎকারে, মাটি ফুঁড়ে উঠা অসংখ্য শিয়ালের ভেঙচিতে। চারটা রাত ভয়ে সিটিয়ে তাকে মা-ছেলে। মাঝে মাঝে বাড়ির উপর ঢিল পড়ে দুপ-ধাপ,বৈশ্বানর উইক -এন্ডে শুক্রবার রাতে বাড়ি ফেরে ,তাকে আঁকড়ে ধরে নৈর্ঋতি-এপাড়ায় এসে ভুল করলাম নাতো। কি বলবে বৈশ্বানর? বৈশ্বানর অনেক দেখা মানুষের একজন। প্রতিনিয়ত তাকে চেষ্টা চালাতে হয় কিছু না দেখার কৌশল শেখার। কিন্তু মনের মানুষটি তো আর চট করে মরতে চায় না। ইচ্ছা হয় তীব্র বেগে ফেটে পড়ে বাঁধা সময়,সামাজিক নিরাপত্তা,দ্বন্দ্ব-পেট নামক আদিম যন্ত্র। নৈর্ঋতি জানে বৈশ্বানরের কিছু বলার নেই। প্রত্যেকটা পাড়া,মহল্লা চলে গেছে তোলাবাজদের দখলে। নৈর্ঋতি এখন চোখের ভাষা পড়তে পারে। ছেলের স্কুল পথে শিতল কঠিন চোখের শাসানি-টাকা দেও ,নয় বাড়ি ছাড়! না, এবাড়ি কিছুতেই নৈর্ঋতি ছাড়তে পারবে না। ইটে ইটে ঘাম ভালবাসা। ছেলে তনুকে এড়িয়ে ভাতরুমে একটু একা থাকতে চায় নৈর্ঋতি। ঝরনার জল ভিজে যায় কান্নায়। কোথায় রবীন্দ্রসংগীতের আনন্দধারা। দুয়ার ভাঙা ঝড়ে মাটির গন্ধ খুবলে খাচ্ছে চিল।

– ও বৈশ্বানর,উত্তাল হাওয়া কোথায়?

বৈশ্বানর একেবারেই সমঝোতর চেষ্টা করেনি তা নয়। ক্লাব সদস্য সারথি বোসকে ধরলে ভেবেছিল কাজ দেবে। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার বড় ঘরের ছেলে, প্রমোটিং এর ব্যবসা করে , বোম্বাটে মার্কা ছেলেদের থেকে একটু আলাদা,তবে ওঠা বসা ওদের নিয়েই। সারথি বলটা ঠেলেছিল রিজু নায়েকের কোর্টে–দাদা, আমি ব্যক্তিগত ভাবে এসবের বিরুদ্ধে। আর আপনিও ক্লাবকে টাকা দিতে বাধ্য নন। আপনি একটা কাজ করুন, রিজুদার সাথে কথা বলুন। উনি আমাদের ব্যাপারগুলি দেখেন। রিজু বাবু একসময়ের দাপুটে নেতা। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে এখন খানিকটা বেকায়দায়।তবু হাতির দর তো আর সহজে পড়ে না। রিজু বাবু দু'জন লোকের সাথে কথা বলছিলেন পার্টি অফিস চেম্বারে-ঠিক আছে রাধা বাবু, আমরা কিন্তু এভাবে ভাবি না। প্রশাসনের স্বচ্ছতা থাকুক আমরা চাই। ব্যক্তি নিয়ে আমাদের দল না। আমিও চাই না প্রশাসন আপনার অন্যায় আবদার মেনে নিক। লোক দু'টি চলে যেতে বৈশ্বানরকে ঈঙ্গিতে ডাকল রিজুবাবু-হ্যাঁ বলুন। বৈশ্বানর নিজের পরিচয় দিয়ে বলল–সারথি পাঠিয়েছে। নবকুড়ি ক্লাব আমার কাছ থেকে এক লড়ি ইট আর ত্রিশ বস্তা সিমেন্টের দাম চেয়েছে।

–ও আপনি সেই বৈশ্বানর বাবু। হ্যাঁ সারথি আপনার কথা বলেছে।

–ওরা টাকা না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ির কাজ বন্ধ রাখতে বলেছে। এর মধ্যে অনেক ইট , রড চুরি গেছে।

–না–না আপনি কাজ চালিয়ে যান, আমি দেখছি। বাড়ি করতে গেলে ছোট খাট চুরি টুরি হয়, রিজু বাবু সিগারেট ধরালেন।

–আর টাকার ব্যাপারটা?

–টাকাটা আপনাকে দিতে হবে। আপনার ভাল লাগা না লাগা মতনই তো কাজ করতে পারবেন না।কিছু সামাজিক রীতিনীতি আছে,নাকি? সিগারেটের ধোঁয়ায় রিজুবাবুর মুখ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল-ছেলেরা সারা জীবন কাঠি চুষবে না। আপনার না হয় চাকুরী আছে। সারথি বলছিল-আপনি নাকি পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন। পুলিশ কিন্তু আপনাকে চিরকাল প্রটেকশন দেবে না। আমরা জানি কার কতটুকু ক্ষমতা। ধোঁয়ায় রিজুবাবুর মুখ আর চেনা যাচ্ছিল না। গত পৌষ পাবনের মেলায় তনু একটা মুখোশ কিনতে চেয়েছিল। সারা মেলায় লাদেনের মুখোশ ভর্তি। অন্য কোন মুখোশ ছিল না,পছন্দ হয়নি বৈশ্বানরের। বৈচিত্রের অভাব। বৈশ্বানরের মাথা ঘুরে যায়–এখানে এত মুখ-মুখোশ! উপড়ে ফ্যাল সব গাছ। শালা বাড়ি করে ভেবেছে শিকড় গেড়েছে। এই সপা–সাইকাস গাছটা টব শুদ্ধ গুঁড়িয়ে দে।

বাইরে শোরগোল শুনে তিনজনই প্রায় দৌড়ে এল সামনের বারান্দায়।চোখের সামনে অ্যালামুন্ডা গাছটা হ্যাচকা টানে নামিয়ে দিল কার্তিক। গাছ ভর্তি হলুদ ফুল। অনেক কুড়ি ফুটি ফুটি। চোখের নিমিষে সে পিষে দিল মাটিতে। সপা-কার্তিকরা জনা সাতেক ছেলে তান্ডব চালাচ্ছে। ছোট সাজানো বাগানটা দলে মুচড়ে, পিশে দিল। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ক্লাবের ছেলে। অন্যরা স্থানীয় ষ্ট্যান্ডের অটোওয়ালা। বেশ কিছু ছেলে দুরে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের ধ্বংসলীলা। ক্লাব সদস্য গৌরাঙ্গ হাত তুলে নির্দেশ দিচ্ছে–শালা ভিখারীর বাচ্চা, পূজার ফুল তুলেছিল বলে মাকে বলে কিনা চোর। হুরকো দিয়ে দেব।

রোজ সকালে কে বা কারা ফুল তুলে নিয়ে যায়। জবা গাছটায় মস্ত একটা কুড়ি উকি দিচ্ছিল শনিবার বিকালে। প্রথম কুড়ি শিহরনটাই আলাদা নৈর্ঋতি, বৈশ্বানরের মধ্যে স্রষ্টার অনুভুতি, মনে হয় ছোট্ট ছোট্ট তনু হাসে। নৈর্ঋতি বলেছিল-জবাটা কাল ফুটবে,তাড়াতাড়ি উঠে দেখতো,কে ফুল তোলে। রবিবার সকালে অন্ধকার থাকতেই বৈশ্বানর হাতে নাতে ধরে ফেলেছিল চোরটাকে। মহিলা ফুল চোর।

-আরে পাঁচিল টপকে ফুল চুরি কর,ব্যাপার কি? গাছের প্রথম ফুলটাই তুমি তুললে। আর এদিকে এসো না কখনো। তখন জানত না মহিলা কে। পরে শুনেছে সে গৌরাঙ্গের মা, ফুল তুলে সে বাজারে বিক্রী করে। একেবারে সখের চোর নয়, যে চুরির ফুলে ঠাকুরের পূজা দেবে। গৌরাঙ্গের কথার মানে পরিষ্কার হয়। ক্লাব মওকা পেয়েছে। টাকা দেও নয় বাড়ি ছাড়। সবটুকু ভয়ভীতি ছিল গৌরাঙ্গরা ঝেড়ে ফেলেছে। ছেলেগুলোকে আর চেনা মনে হচ্ছে না। বৈশ্বানরের মাথা কাজ করছে না,কি করবে সে? আশেপাশের বাড়ির জানালা ধপাস ধপাস করে মুহুর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল। অথচ সবার নাকি করুন অভিজ্ঞতা আছে। জমি বাড়ি কেনার সময় সকলে মাথা মুড়িয়ে এসেছে। স্রেতের উল্টোদিকে একা হাঁটা যায় না। নৈর্ঋতির চোখ ফেটে কান্না আসতে চাইছে। ঠোঁট কামড়ে গিলছে কান্না। দুহাতে গ্রিল ধরে আছে,তবু সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। মরিয়া হয়ে বৈশ্বানরকে ঝাকিয়ে দেয়-কিছু একটা কর,পুলিশকে খবর দাও। তনু ভয়ে ছুটে পালিয়েছে ঘরের মধ্যে।

-আরে শোন সপা, মুরগির খাঁচা থেকে পুলিশ দেখাচ্ছে। দে তো শালীর দরজা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দে। কাঠের দরজার উপরে জোড়া পায়ের লাথি,দরাম দরাম। থরথর কাঁপার শব্দ, যে কোন মুহুর্তে ভেঙ্গে যাবে কাঠের দরজাটা, বেনো জলের মতো ঢুকবে গৌরাঙ্গে ও দলবল। নবকুঁড়ি ক্লাবের ছেলেরা। বৈশ্বানরের সাথে তাদের খাদ্য-খাদক সর্ম্পক। নিমিষে তছনছ হয়ে যাবে গোটা সংসারটা নৈর্ঋতির সপ্ন সুখ।

নৈর্ঋতির বুক ফেটে যাচ্ছে, নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছে না। বৈশ্বানর কিছু বুঝে উঠার আগেই দরজা খুলে বানের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে নৈর্ঋতি। দু'হাতে ফাসের মতো জাপটে ধরেছে গৌরাঙ্গের গলা। যেন নৈর্ঋতির মরন কামড়। কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। হাত দুটো আরো কষে ফাঁসের গিরা হয়ে যাচ্ছে।

অন্য ছেলেরা হতচকিত। গৌরাঙ্গর জানালায় মাথা চাপাপড়া টিকটিকর অবস্থা। তীব্রবেগে লেজ নাড়ছে বেরিয়ে আসার জন্য। পৌঙ্গব মূর্তি নেই। শুধুই ভ্যা-ভ্যা।

ঠিক সেই সময়ে পুলিশ জিপটি এসে থামল বাড়ির সামনে। ইন্সপেকটর লাফিয়ে নামল জিপ থেকে। জিপ দেখেই কার্তিক,সপারা পালাল। কিন্তু ক্লাবেরঅনেক ছেলে তখনও আছে। তারা সামনে এসে বলল-স্যার বদমাসটাকে বৌদি ধরেছে। আগেওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। হাড় গোড় গুঁড়িয়ে দেব। ওদের জ্বালায় ক্লাবে টেকা দায়। ক্লাবটা বানিয়ে ফেলেছে এন্টিসোসালদের ডেন।

ইন্সপেকটর নৈর্ঋতির কাছে গিয়ে বলল-বৌদি ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। আমি দেখছি তোলাবাজটার কত ডিগ্রি লাগবে।

বৈশ্বানর ততক্ষনে ছেলের হাত ধরে নৈর্ঋতির কাছে চলে এসেছে। তাকে দেখেই ইনসপেক্টর চিনতে পারল-স্যার চিনতে পারছেন। বসিরহাটে আপনার সাথে ডিউটি করেছি। আমাদের আগে জানালেই পারতেন।ব্যাটারা ভেবেছে কি? প্রশাসন মরে গেছে নাকি।

নৈর্ঋতি গৌরাঙ্গকে ছেড়ে দিয়েছে। তনু দৌড়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। গৌরাঙ্গ মাথা নিচু করে হাঁপাচ্ছে। ইনসপেক্টর রক্তিমবাবু গৌরাঙ্গকে জীপে তুলতে গেল–
–না,ইনসপেক্টর ওকে ছেড়ে দিন–নৈর্ঋতি বলল।
–বলছেন কি ম্যাডাম?
–হ্যাঁ আমি বলছি,ওকে ছেড়ে দিন। নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।

নৈর্ঋতি এখন মানুষের ভাষাপড়তে পারে,বুঝতে পারে হাওয়ার বেগ। গলির জানালাগুলি একে একে খুলে যাচ্ছে নৈর্ঋতির শরীর জুড়ে নরম মেঘের স্বর।

সসীম কুমার বাড়ৈ, কোলকাতা